মা এসেছেন

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

'মা' শব্দটি জগতের সহজতম শব্দ। একটি শিশুর প্রথম উচ্চারিত শব্দ 'ওঁয়া' বলে কেঁদে ওঠা, ওই 'মা' শব্দটিরই অক্ষম উচ্চারণ। তাই মা বললেই একটি নিকটতম, সহজতম সম্পর্কের কথা মনে ওঠে। কিন্তু সে-সম্পর্ককে যথার্থ প্রকাশ করা ভারি শক্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে/ সহজ কথা যায় না বলা সহজে।'' কারণ জীবনে সহজ হতে পারাই সবচেয়ে কঠিন আর তা বহু সাধনার ফল। ''সহজ না হলে সহজেরে যায় না চেনা।'' সহজ মানে সহজাতও বটে—মানুষ জন্মেই যে-অবস্থায় থাকে—সমস্ত উপাধিমুক্ত। তাই তার সহজ আনন্দ সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করে। মহাপুরুষেরা তা নিয়ে শুধু জন্মান না, সেটিকে আজীবন আশ্রয় করে থাকেন। তাই জগদীশ্বরী যখন সহজ আটপৌরে মা সেজে গ্রামের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে থাকেন, তখন তাঁকে চেনে কার সাধ্য! তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যকে একান্ত ভালবাসায় পরিণত করে তাঁর নিজস্ব পেটিকায় পুরে যখন আসেন, তখন সে-ভালবাসার পরিমাপই বা করে কে! আমাদের হৃদয়ে অহংকার, অভিমান, ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ তাদের স্থান অধিকার করে নেওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, সেটুকু স্থানও তাঁর ভালবাসার ছোঁয়া পেলে এক অলৌকিক আস্বাদনের আভাস দেয়। আর যদি সে-আভাসটুকু ধরে রাখতে পারি, তাহলে ক্রমে আমাদের ঈর্ষা, দ্বেষ, অহংকার, অভিমানকে সরিয়ে সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করে সে আমাদের পূর্ণ করে দিয়ে যায়।

যত দিন যাচ্ছে আমাদের জীবনের জটিলতা বাড়ছে, কারণ ভোগসামর্থ্য ও তার জোগানই আমাদের উন্নতির নিরিখ। উন্নতির সমস্ত পরিসংখ্যান শিল্পোৎপাদন ও ভোগ্যবস্তুর বিপণনের ওপর ভিত্তি করে। ভোগের উপকরণ ও ক্ষমতার বৃদ্ধিতেই আমাদের সব শক্তি নিয়োজিত, মনুষ্যত্বের উন্নয়নে নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বাহ্য উন্নতির উপযুক্ত হয়ে ওঠা। ফলে উচ্চশিক্ষিত অমানুষের আজ ছড়াছড়ি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদা যখন এসেছিলেন তখন একটি যুগক্ষণ, বর্তমান ভোগবাদের অরুণোদয়। সমগ্র বিশ্বে মানব-জীবনকে জটিলতা যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে, এটি জেনে তার চরম পরিণতিকে রোধ করতেই তাঁদের আসা। তার মধ্যে মায়ের আসাটি যেন একটু আলাদা, একটু বিশেষত্ব দাবি করে। এত নিরুচ্চার, নিঃশব্দে তাঁর প্রবেশ, আর অতিসহজ জীবনের প্রতিটি অঙ্গে এমন সহজতার প্রকাশ যে, তিনি না

ধরা দিলে ধরে কার সাধ্য! মনে হতে পারে ধরাই যদি না গেল তাহলে তাঁর আসার সার্থকতা কোথায়? সার্থকতা এখানেই যে, জটিল সংসারের আবর্তে থেকেও জীবন কতটা সহজ ও শান্তিময় হতে পারে তা দেখানো। জীবনে জটিলতার আবর্ত যে স্বেচ্ছাবৃত, এটি জেনে তার হাত থেকে যখন কেউ মুক্তি চাইবে, তখন তার কাছে তাঁর জীবনটি একটি আদর্শ হয়ে উঠবে। একদিকে তাঁর জীবন আর সে-সহজ জীবনের বিশেষ প্রকাশ তাঁর ঘরোয়া উপদেশে। মনে হয় সহজ, কিন্তু সহজ নয়। না, এ হেঁয়ালি নয়; বরং সে-সহজ কথাগুলির গভীরতার পরিমাপ চলেছে আজ একশো বছর ধরে, আর যত দিন যাচ্ছে ততই তার গভীর ভাব উপলব্ধি করে অবাক হচ্ছে মানুষ। তাঁর নীরব জীবনসাধনার ফল নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছে জগতময়।

শ্রীমা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণ-মুদ্রার অপর পিঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বীজাকারে স্থিত মাতৃত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতেই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর নিজের কথায় : ''ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল, সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ তাই তাঁর জীবদ্দশাতেই শ্রীমার স্বরূপ সবার কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বলেছিলেন, ''ও আমার শক্তি।'' তাঁর অন্তরালে থাকার অদ্ভুত ক্ষমতাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, ''ও ছাইচাপা বেড়াল''; এবং শেষ কথাটি বলেছিলেন, ''ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।'' কিন্তু যুক্তিবাদী, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভক্তসমাজ, এক নিরক্ষর গ্রাম্য অন্তরালবর্তিনী সম্পর্কে এতটা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। ''শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী যখন তখন কিছু বিশেষত্ব নিশ্চয় আছে''—এই ভাবনার বেশি তখন কেউ ধারণা করেছিলেন বলে জানা যায় না। একমাত্র স্বামীজীর তাঁর সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার ছিল এবং তা কীভাবে হয়েছিল তা আমরা জানি না। আর তা হয়েছিল স্বামীজী হয়ে ওঠার বহু আগে থেকেই। তখন তিনি নরেন, এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন ঘরে নেই। ভবতারিণী দেবী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী তখন সাত-আট বছরের মেয়ে, শ্রীমায়ের কাছে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর ঝাঁট দিতে এসে দেখেন তাঁর নরেনদা এসেছে। তাঁকে নরেন বললেন, ''দ্যাখ শাঁকচুন্নী, ওই কলসী থেকে জল গড়িয়ে খাওয়া, তেষ্টা পেয়েছে।'' ছোট মেয়ে বেঁকে বসে : ''পারবনি। তুমি আমাকে বিশ্রী নামে ডাক কেন?'' নরেন বলেন, ''ওরে শাকচুন্নী, তুই তোর ওই হাত দিয়ে জল তামাক খাওয়ালে আমার মতো সুন্দর হয়ে যাবি।... এক গ্লাস জল দে, আর তামাক সেজে আন এক ছিলিম।'' কী আর করা, মেয়েটি তার নরেনদাকে জল দিয়ে ছুটল তামাক সেজে আনতে। মায়ের কাছে যেতেই মা তার হাত থেকে কলকেটা নিয়ে পরিপাটি করে সেজে একটা নারকেলের মালায় বসিয়ে দিলেন। এরকম পরিপাটি সাজা দেখে নরেনের সন্দেহ হল, কে সাজালে এমন! মা সাজিয়ে দিয়েছেন শুনে মাথায় হাত, বলে উঠলেন, ''ওরে শাকচুন্নী করেছিস কি? সর্বনাশ, আমি এখন ঐ কলকেতে তামাক খাই কি করে?'' কলকে মাথায় ছুঁইয়ে তামাক ফেলে দিয়ে আবার নিজেই সেজে খেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন নরেন তামাক খান, তা নিয়ে লুকোছাপাও নেই, এমনকী ঠাকুরের অনুরোধে তাঁর হাত থেকেই কলকেতে তামাক টেনেছেন। অথচ মায়ের ক্ষেত্রে এত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা! এই শ্রদ্ধার বশেই ঠাকুরের নির্দেশ পেয়েও মায়ের অনুমতি চাইলেন বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে। স্বামীজীই প্রথম তাঁর গুরুভাইদের কাছে মায়ের জগজ্জননীত্ব খ্যাপন করেন ও সঙ্ঘ গঠনের পর তার শীর্ষে সঙ্ঘজননী হিসেবে মাকে বসিয়ে যান।

শ্রীমার সাধনজীবনের সিংহভাগই আমাদের অজানা; আর সেই অজানা সাধনের উপলব্ধি থেকে তুলে আনা স্নেহের মোড়কে মোড়া কথাগুলি ও সেই সঙ্গে তাঁর জীবনচর্যা সারল্যে, সহজতায় সমগ্র বিশ্বের মর্মে স্থান করে নিয়েছে। এটি ভক্তের ভক্তির আতিশয্য প্রকাশ নয়। পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী তাঁর 'শ্রীশ্রীমা ও আদর্শ জীবন' প্রবন্ধে বলেছেন, ''শ্রীশ্রীমা আমাদের কি দিয়ে গেলেন, তা একটু দেখা যাক। এমনিতে তাঁর জীবনের ভেতর কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না; তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করে গেছেন। অবশ্য তার ভেতর একটা মাধুর্য ছিল। আমরা প্রথমে তা ধরতে পারিনি। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ১ম ও ২য় ভাগ যখন বেরুল, দুটো ভাগই পড়ে ফেললাম। একজন ভদ্রমহিলা প্রতিদিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে সারাদিনের ঘটনাগুলি লিখে রেখেছিলেন; ১ম ভাগে সেই কথাই, মায়ের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিই বেশি। ২য় ভাগে মায়ের উপদেশই বেশি আছে।... আমি ২য় ভাগটিকে বেশি পছন্দ করেছিলাম।... কিন্তু বইগুলি যখন ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে আমেরিকায় গেল, সেখানকার মেয়েরা সবাই প্রথম ভাগটিকে পছন্দ করলেন বেশি। নিজেদের যে জীবনাদর্শ, তাতে তাঁরা শান্তি পাচ্ছিলেন না; ভারতবর্ষের মেয়েরা আগে কিভাবে জীবনযাপন করতেন, সেইটি তাঁরা খুঁজছিলেন। মায়ের জীবনে সেইটি পেয়ে গেলেন, শান্তিলাভের পথ খুঁজে পেলেন।''

এই স্বচ্ছ সমীক্ষাটি আমাদের ভাবায়—সত্যিই তো! কী ছিল তাঁর দিনচর্যায়! চেতনানন্দজীর প্রশ্নে শ্রীমায়ের সেবক বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ) নির্ণয় করেছিলেন বাড়ির মা-বোনের সঙ্গে মায়ের পার্থক্য : ''তুমি কোনও মানুষ দেখেছ যে একেবারে বাসনাশূন্য? শ্রীমা ছিলেন সম্পূর্ণ বাসনাহীন।'' রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) একই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ''অভিমানহীন, অহংকারহীন মানুষ কি কেউ কখনও দেখেছ? মা ছিলেন ঠিক তাই।'' এই দুটি গুণই তাঁর নিত্য দিনযাপনে ফুটে উঠত আর সেটিই তাঁর প্রতি সমস্ত আকর্ষণের উৎস। আবার সেটিই তাঁর সরল অথচ গভীর উপদেশেরও ভিত্তি।

তাঁর জীবন ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিকের এক অপূর্ব সমন্বয়ে অন্বিত। নিবেদিতার ভাষায় "No more secular and sacred"। মা বলতেন সকলকে একটু মান্যতা দিয়ে চলতে হয়, নাহলে সংসারে শান্তি থাকে না। সাধারণ কথা, আবার অসাধারণও। সকলকে মান্যতা দিতে গেলে নিজের অহংকারকে দাবিয়ে চলতে হয়, এবং কালে সেটিই অহংনাশের সাধন হয়ে ওঠে। আবার বলছেন, ''দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই, ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়।'' এটি পালন করতে গেলে পরচর্চা, পরনিন্দা যা আমাদের জীবনের অঙ্গ তা বাদ দিতে হয়। পরনিন্দার আনন্দ আঠার মতো, শুরু হলে তার থেকে বেরোনো মুশকিল, আর সেই আঠায় চর্চিত ব্যক্তির দোষগুলি আমাদের অধিকার করে। মন সংস্কারের ক্ষেত্র, সেখানে যে-বিষয়ের আলোড়ন যত হবে তার সংস্কারের ছাপ পড়বে তত গভীরে। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে মায়ের কথা মানতে হবে। সরযূবালা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, একদিন মা বলছেন, একটি মেয়ে তার পাপকর্মের কথা ঠাকুরের কাছে বলে খালাস পেয়ে গেল। তাতে নলিনীদিদি বললেন, ''তাই কি হয় মা? পাপের কথা একবার মুখে বললে আর সব ধুয়ে গেল?'' মা বললেন, ''তা যাবে না? তিনি যে মহাপুরুষ, তাঁর কাছে বললে যাবে না? আর এক কথা শোনো, পাপ-পুণ্য প্রসঙ্গ যেখানে হয় সেখানে যত লোক থাকে, তাদের সকলকে সেই ভালমন্দের একটু না একটু অংশী হতে হয়।... মনে কর একজন তোমার কাছে তার পাপ-পুণ্যের কথা বলে গেল।

মনে কখনও সেই লোকের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ ভালমন্দ কাজগুলির চিন্তা এসে পড়বে। এইরূপে সেই ভাল বা মন্দ দুই-ই তোমাদের মনের ওপর একটু কাজ করে যাবে।" ঠিক একই কথা পরনিন্দা, পরচর্চার পক্ষেও প্রযোজ্য। ভক্তের বৃথা কথা, বৃথা কাজ কেন ভক্তিপথের অন্তরায় তার অতিসরল ব্যাখ্যা পেলাম আমরা মায়ের কাছে।

এক অদ্ভুত সহমর্মিতা নিয়ে 'যাকে যেমন তাকে তেমন' ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত দেখি মায়ের জীবনে। সরযূবালা দেবী মায়ের বাড়ির কাছাকাছি তাঁর বোনের বাড়িতে থাকেন শুধু মায়ের সঙ্গ করবেন বলে। শ্রীমাও তিনি একদিন না এলে তাঁর জন্য ভাবিত হন। শ্বশুরবাড়ি কালীঘাটে, স্বামীকে ছেড়ে থাকায় তাঁকে কথা শুনতে হয়, তাই একটু লজ্জিত থাকেন। সে-দ্বিধার কথা মাকে জানালে মা বললেন, ''ঢের দিন তো সংসার করলে। লোকের কথা ছেড়ে দাও, তারা অমন বলে থাকে।" আবার এক মহিলা তাঁর পুত্রবধূকে খুব শাসনে রাখেন, ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে। তাঁকে বলছেন, ''অত কি ভাল? পেছনে থেকে সামনে একটু আলগা দিতে হয়। আহা ছেলেমানুষ বৌ, তার একটু পরতে খেতে ইচ্ছে হয় না?—একটু আলতা পরেছে তা আর কি হয়েছে?" নিজেকে তার স্তরে নামিয়ে এনে বলছেন, ''আহা! ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো চোখে দেখেছি, সেবাযত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি...।"

''ঠাকুরই সব। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট, তাঁর মাঝে গুরু ইষ্ট সব পাবে। তিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। তিনি সর্বদেবময়, সর্ববীজময়। তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।"—দীক্ষার পর দীক্ষিতকে মা সাধারণত এই ধরনের কথা বলতেন। মনে হয় নিজেকে অন্তরালে রাখা, অভিমানহীনতার কারণে একথা বলতেন। কিন্তু কথাগুলি চিন্তা করলে এর গভীরতম অর্থ আমরা খুঁজে পাই, যা সন্ন্যাসী ও ভক্ত সমন্বিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ আচরণের নির্ণায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণই একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি, আবার ধ্যানমন্ত্র অনুসারে প্রকৃতিবিকৃতিশূন্য, নিত্য ও আনন্দমূর্তি। দ্বৈতভাবে যতরকম ঈশ্বরীয় রূপ আছে, সে-সকলের মধ্যে তাঁরই প্রকাশ। বীজমন্ত্র ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশক। ঈশ্বরীয় যত ভাব ছিল, বর্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হতে পারে সেসবই তাঁর ভাবের অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি সর্ববীজময়। আবার তিনি নির্বিশেষ, নির্গুণ, অদ্বৈতসত্তার মূর্তরূপ। তাঁর অতলস্পর্শী অন্তর্মুখ চোখদুটি, যেটি দেখে ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন, ''এ অতি উচ্চ অবস্থার ছবি", তা দ্বৈত ও অদ্বৈতের সেতু হয়ে আছে। ওই চোখদুটির 'রূপসাগরে' ডুব দেয় নিরাকারবাদীরা 'অরূপরতন আশা' করে। এই সঙ্ঘে দীক্ষার সময় গুরু দীক্ষার্থীকে শ্রীরামকৃষ্ণভাবে অভিষিক্ত করে তাকে তাঁর চরণে অর্পণ করেন এবং দীক্ষিত ব্যক্তি তার গুরুকে ঠাকুরের আসনের স্থলাভিষিক্ত বলে মনে করে। গুরু শরীরে না থাকলেও সঙ্ঘগুরুই তার গুরু—এই ভাবনা তাকে ধরে রাখতে হয়। মায়ের এই সহজ কথাটি গুরুবাদ ও তজ্জনিত সম্প্রদায়সৃষ্টির সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, তাঁর গুরু, কর্তা ও বাবা এই তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে, কিন্তু সে দেহবোধ থাকলে। তাঁর মন কখন কোন স্তরে থাকত তা বোঝা মুশকিল, মনের স্তর অনুযায়ী তাঁর ব্যবহারও অনুরূপ হত। ঠাকুর যখন কাশীপুরে তখন কয়েকজন ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সঙ্গে আনা জিনিস ঠাকুরের ঘরে তাঁকে উদ্দেশ করে ভোগ দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঠাকুর একথা শুনে মাকে বললেন, ''এরা এ কি করলে বল দেখি?" শ্রীমা চিন্তিত হলে ঠাকুর রাতে মাকে বললেন, ''দেখ, এর পরে ঘর ঘর আমার পুজো হবে। পরে

দেখবে—একেই সবাই মানবে, তুমি কোনও চিন্তা করো না।" সেদিনই মা তাঁকে 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করতে শুনেছিলেন।

মা খুব সহজ কথায় বলেছেন, ''ঈশ্বরলাভ করলে কী হয়? দুটো কি শিং গজায়? না, মন শুদ্ধ হয়।" মনে হতে পারে, এত তপস্যা করে শেষে মাত্র মন শুদ্ধ হওয়া! কিন্তু ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই। মন শুদ্ধ কখন?—যখন সেখানে কোনও বাসনা নেই। আমরা, মন বলে যে একটা বস্তু আছে তা বুঝি তার চাঞ্চল্য দেখে, তার নিরন্তর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গমনাগমন দেখে। এই চাঞ্চল্য, বাসনারূপ হাওয়ায় প্রদীপশিখার চাঞ্চল্যের মতো। বাসনা না থাকলে মন স্থির, তখন আমাদের মনের ধারণার লয় বা মনের লয়। লয় হলে তার আশ্রয় কোথায়? যেখান থেকে তার উৎপত্তি সেই শুদ্ধ আত্মাতে। আবার বুদ্ধি শুদ্ধ মানে সেখানে কোনও সংশয় নেই, কারণ সংশয়ই বুদ্ধিকে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে দেয় না। যুক্তিবোধের সিদ্ধান্ত আর অনুভূত সিদ্ধান্তের প্রভেদই সংশয়ের জন্মদাতা। এ-জগৎ অনিত্য তা যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে বেশ বুঝি, তবু তাকে অনুভব করি নিত্য বলে। যখন বোধে অনিত্যের ধারণা স্থির হয় তখন সংশয় দূর হয়ে যায়, আর বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে শুদ্ধ মনে লীন হয়ে যায়। আমাদের অহং, যা অশুদ্ধ বুদ্ধি ও মনের প্রভাবে নিজেকে সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র বোধ করছিল তার থেকে তার মুক্তি ঘটে। তখন যা থাকে তাই শুদ্ধ আত্মা। আসলে ঈশ্বরলাভ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রায়শই অতিপ্রাকৃত। ধনসম্পদ-ঐশ্বর্যলাভের মতো এটি বাইরে থেকে পাওয়া কোনও জিনিস নয় সেটা আমরা বুঝতে পারি না। স্বামীজী বলেছিলেন ধর্ম মানে হয়ে ওঠা, অন্তরের দেবত্বকে প্রকাশ করা, যার পূর্ণ প্রকাশে দেবতা হয়ে ওঠে মানুষ। বলরামবাবুর 'কিছু হল না' বলে খেদোক্তির উত্তরে স্বামীজী লিখেছিলেন, ''সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপসোস করিয়াছেন। কথা ঠিক বটে, অথচ নহে বটে। Ideal bliss-এর দিকে চাহিতে গেলে একথা সত্য বটে, কিন্তু যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর।" একই আক্ষেপ শুনে সারদানন্দজী মজা করে বলেছিলেন, ''কি হবে বাবা! চারটে হাত গজাবে? তাহলে শোবে কী করে?" কবির ভাষায় : ''লুকায়ে আছেন যিনি হৃদয়ের মাঝে/ তারে আমি প্রকাশিব সংসারের কাজে।" মায়ের জীবন তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

মা খুব সহজ করে বললেন, ''ছায়া আর কায়া সমান।" অর্থাৎ স্থূলদেহের সত্তা তার প্রতিবিম্ব বা ছবিতে বর্তমান। মনে হয় তা কী করে হতে পারে! কিন্তু একটু বিচার করলে এর যুক্তিসিদ্ধতা খুঁজে পাই। যে-কোনও ব্যক্তি, যাকে আমরা দেখি বা তার সংশ্রবে আসি, তার সত্তার বাস কিন্তু আমাদের মনে। একজন পরিচিত মানুষ মানেই একটা ভাব যা আমরা তার সম্বন্ধে গড়ে তুলেছি, তার চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি ও জীবনকে দেখে। তাই তাকে দেখলে যেমন সে-ভাবটি মনে আসে তেমনই তার ছবি দেখলেও তা-ই মনে আসে। তার স্মৃতিজড়িত কোনও জিনিস দেখে তার কথা মনে পড়লেও সেই ভাবটিই মনে জাগে। শ্রীশ্রীমাকে নিবেদিতা একটি আসন দিয়েছিলেন, তার জীর্ণাবস্থা দেখে সেবক সেটি ফেলে দিতে চাইলে মা বলেন, ''না বাবা, ফেলো না, ওটি দেখলেই নিবেদিতার কথা মনে পড়ে।" অর্থাৎ সে-আসনটির মধ্যেও তাঁর সত্তা বিরাজমান। জীবিত অবস্থায় মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদান চলে বটে তবে তার সত্তাটি সেই ভাবটিকেই আশ্রয় করে থাকে। তাই ছায়াতে কায়ারই সত্তা, অন্তত আমাদের মনে। বিজ্ঞানানন্দজীকে ঠাকুর বলেছিলেন নিজের ছবি দেখিয়ে, ''এর ধ্যান করবি, এর মধ্যে আমি আছি।" রবীন্দ্রনাথ কোনও প্রেরণার উৎসকে হারিয়ে

তাঁর ছবি দেখে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেটি কি শুধুই ছবি, অন্তত দূর অন্তরিক্ষে চলমান বস্তুর মতনও কি সত্য নয়? নিজেই উত্তর পেলেন : ''নয়ন সমুখে তুমি নাই/ নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।'' বুঝলেন সেই ঠাঁই থেকেই তিনি প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন : ''কবির অন্তরে তুমি কবি/ নও ছবি, নও শুধু ছবি।''

মাকে কোনও ভক্ত ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলছিলেন। মা তাতে বললেন, ঠাকুর যে পরিকল্পনা করে ধর্মসমন্বয় করেছিলেন একথা তাঁর মনে হয়নি, বরং ''এই যুগে তাঁর ত্যাগই হলো বিশেষত্ব। ও রকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনো কেউ দেখেছে?'' আমাদের মনে হয় জগতের সব মত-পথের সমন্বয়ই ঠাকুরের আসার উদ্দেশ্য, অথচ মা গুরুত্ব দিলেন তাঁর স্বাভাবিক ত্যাগের ঐশ্বর্যের ওপর। আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিলেন ত্যাগের দিকে। আমরা বুঝলাম তাঁর করা সমন্বয়ের বৌদ্ধিক চর্চায় কোনও লাভ নেই। তাকে আত্তীকরণ করতে গেলে যোগ্যতালাভ করতে হবে, আর তার ভিত্তি ত্যাগ। এযুগের এই ভোগবাদী, উপভোক্তা সংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে ত্যাগের ভাবটিই অন্তর্হিত। উন্নয়ন বলতে বাহ্য উন্নয়ন। শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ফল, আমাদের ভোগবাদী জীবনের মান বাড়াতে সাহায্য করতে পারে কি না তাই দিয়েই তার বিচার হয়। তা মনুষ্যত্বের মান বাড়াল কি না সেটির কোনও গুরুত্ব নেই। মনে করা হয় ত্যাগ একটি নেতিবাচক ধারণা। কিন্তু এই ধারণাকে ত্যাগ করতে গিয়ে যে জীবনের ইতিবাচকতাকেই জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে সেকথা মনে আসে না। ত্যাগ মানে কমণ্ডলু নিয়ে সংসার ছেড়ে বনে চলে যাওয়া নয়—ভোগবাদিতায় রাশ টানা, আমাদের চিরন্তন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের পথে মানবধর্ম পালন করে অর্থোপার্জন এবং সেই অর্থে নিয়ন্ত্রিত ভোগবাসনা পূর্ণ করে তার অসারতা বোঝার চেষ্টা, আর সে-প্রয়াসে সফল হলে মুক্তির চেষ্টা। এদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা এত সহজ ভাষায় আর কেউ বলেনি।

আর সত্যি সত্যি বলবেই বা কে, মা ছাড়া! শিশুর পথ্য-অপথ্য, খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই; কোনটি তার শরীরের উপযুক্ত, কোনটি শরীরের ক্ষতি করবে সে-জ্ঞান নেই। আমরাও এ-জগতে শিশুর মতো সেই পথেই চলেছি, তাৎক্ষণিক তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে। আমাদের সঠিক পথ দেখাতেই তো তাঁর আসা। মায়ের অসীম করুণা, বিনিদ্র রজনীতে আমাদের জন্য জপ, মানবীভাবে আমাদের জন্য ঠাকুরের কাছে আকুল প্রার্থনা—সবই তো আমরা যাতে বেচালে না চলি, বেতালে পা না পড়ে তার জন্য। তাঁর করুণাসিক্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যদি আমাদের মনে পড়ে : ''কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে/ এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে, আপন মায়েরে নাহি জানে''—তাহলে হয়তো আমাদের করণীয় কী তা মনে ওঠে। করণীয় শুধু এটুকুই—তিনি আমাদের জন্যই এসেছেন এই বিশ্বাসে আপনবোধে তাঁর ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা। এই ভারটুকু ঠিকভাবে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। ভোগ, দুর্ভোগ, গ্রহণ, ত্যাগ, সাধনভজন কিছুই শিশুর মনে ওঠে না, সে জানে তার মা আছে। মাও বলেছেন, ''ভয় কি বাবা! আমি মা থাকতে ভয় কি? সবসময় ভাববে আমার একজন মা আছেন।'' তাহলেই আমরা আনন্দে বলতে পারি, ''মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই/ ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই।'' ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (অখণ্ড) (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১২)

২। স্বামী চেতনানন্দ, *প্রাচীন সাধুদের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮), খণ্ড ১